প্রথম অধ্যায়

তারাচরণ শীকদার :

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বাংলায় মৌলিক নাটক লিখিত না হলেও বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হয়েছিল। কিন্তু বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে সংস্কৃত নাটকের ধারাটি সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে নি। তারাচরণ শীকদার প্রথম প্রয়াসেই সংস্কৃতের বন্ধন ছিন্ন করে পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গীককে গ্রহণের সাহসিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকের পরেও অনেকের নাটকে সংস্কৃত প্রভাব যথেষ্ট পরিমানে লক্ষনীয়, এমন কি মধুসূদনের নাটকেও সংলাপ ও আঙ্গিকে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ রয়েছে। প্রচলিত যাত্রার গীত-অভিনয়ের যুগে নাটক রচনা করেও তিনি সঙ্গীত প্রায় পরিহার করেছেন। বাংলা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধারণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলা নাটকের আঙ্গিক পাশ্চাত্য ধারায় লালিত হওয়ার পথপ্রদর্শক তারাচরণ। তিনি একটি মাত্র নাটক রচনা করেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে বাংলা নাটকের কোনো আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না। বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে নাট্যবিষয় রূপে মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকেই অনুসরণ করেছে। তবে দেশীয় যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাটককে এড়িয়ে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণের কথা নাটকের বিজ্ঞাপন অংশে তিনি জানিয়েছেন —

> ''এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে।''[১]

সংস্কৃত নাটকের এই বহিরঙ্গগুলিকেই পাশ্চাত্য নাট্যরীতির বিসদৃশ মনেকরে তিনি তার নাটকে এই সব উপকরণ সচেতন ভাবে বর্জন করেছেন। মহাভারতের আদিপর্বে সুভদ্রা হরণ আখ্যানের মধ্যে কাশীরাম বাঙালি মানসিকতায় যে নাটকীয়তার বীজ বপন করেছেন তাকেই নাট্যাঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন তারাচরণ। মূল মহাভারতে সুভদ্রা হরণ সংক্রান্ত এত তথ্য দেয়া নেই, সেখানে অর্জুন সুভদ্রার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে কোণ উপায়ে লাভ করা যায় তা শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়েছেন। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয় এই অংশের অত্যন্ত সরস বর্ণনা দিয়েছেন—

> ''দাদা বলরাম যেমন গৌরবর্ণ ছিলেন, সুভদ্রার গায়ের রংও তেমনি–কাঁচা সোনার মতো। আর সুভদ্রা তেমনই সুন্দরী, তেমনই কোমল-মধুর তাঁর স্বভাব যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারা যায় না। অর্জুন তাই অনিমিষে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। সুভদ্রার রূপ দ্রৌপদীর মতো আগুনপানা নয়, দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব সম্ভ্রম এমনই যে, তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। কিন্তু সুভদ্রার সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তি আছে, তাপ নেই। অর্জুন অনিমেষে তাকিয়ে ছিলেন, পাশে যে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন তাও তাঁর খেয়াল নেই। অর্জুনের অপলক চেয়ে দেখাটুকু পরম কৌতুহল নিয়ে লক্ষ করছিলেন কৃষ্ণ– তং তদেকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ। অস্ত্রশিক্ষার আসরে যিনি পাখির চোখ ছাড়া কিছু দেখতে পাননি, তাঁকে একইভাবে সুভদ্রার দিকে তাকাতে দেখে কৌতুকী কৃষ্ণের মুখে স্তিমিত হাসি ফুটে উঠল।''[২]

সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত 'হারানো দিনের নাটক' সঙ্কলনে ভদ্রার্জুন নাটকের প্রথমেই একটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সুভদ্রাকে কৃষ্ণের সহোদরা বলা হয়েছে, 'পার্থসারথস্য সহোদরা'। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তারাচরণের গ্রন্থের প্রচ্ছদে সঠিক শ্লোকটিই মুদ্রিত ছিল -

> ''মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।
> সুভদ্র নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা।।''[৩]

সুভদ্রার পরিচয় সূত্রে বলরাম এবং সারণের সহোদরা -এই দু'য়েরই উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তিনি কৃষ্ণের সহদোরা না হলেও কৃষ্ণ তাঁকে সহোদরা ভগিনীর চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এবং সেই ভালোবাসার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন অনেক ভাবে। নাটকে বলরাম এবং কৃষ্ণের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে এই ভুলটি উপেক্ষনীয় নয়। কেননা আজকের দিনে পুরানো বাংলা নাটকের সুলভ সংস্করণ হিসেবে 'হারানো দিনের নাটক' সঙ্কলনের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে।

১৯৬৬ সালে 'ইস্টার্ণ পাবলিশার্স' থেকে প্রকাশিত ভদ্রার্জুন নাটকের ভূমিকায় সুভদ্রকুমার সেন লিখেছেন—

> ''একটি সার্থক, শিল্পসম্মত নাটকের যে যে লক্ষণাবলী বা গুণ থাকা দরকার, সেগুলির প্রায় সবই ভদ্রার্জুনে শোকাবহ ভাবে অনুপস্থিত। সুতরাং ভদ্রার্জুন সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল মূলত ঐতিহাসিক।''[৪]

তিনি আরও বলেছেন—

> ''তবে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম প্রেরণা তারাচরণের নাটক থেকে পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নারদের উক্তি দ্রষ্টব্য এবং অনুমান করা যায় যে মধুসূদন যে সুভদ্রাহরণ কাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন তারও প্রেরণা হয়ত তিনি তারাচরণের নাটক থেকেই পেয়েছিলেন।''[৫]

—অবশ্য সুভদ্রকুমার সেনের আলোচনা বড় বেশি অনুমান নির্ভর। তবে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ভদ্রার্জুনের ঐতিহাসিকতা অনস্বীকার্য। বাংলা নাটকে মহাভারত-কাহিনির নাট্যরূপায়ণের দিক থেকে নাটকটি অবশ্যই গুরুত্বের দাবি রাখে।

নাটকের শুরুতেই দেখা যায় ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় মহর্ষি নারদ বীণারতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে যদুকুল তিলকের গুণগান করতে করতে আগমন করছেন। নারদীয় বাক্যে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের তির্যকতা ফুটে উঠেছে প্রথম থেকেই। পঞ্চ ভ্রাতার ঐক্যসূত্রের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে মুনি র ভাষ্য— 'এই

হেতু পঞ্চেতে একভাবে পাঞ্চালীর পাণি গ্রহণ করিয়াছ।'(১/১) বাস্তবিক পৌরাণিক যুগের সমাজ ব্যবস্থায় polyandry-র সমালোচনা এবং গ্রহণ যোগ্যতা মহাভারতীয় আখ্যানে যেমন রয়েছে নাট্যাংশেও অনুরূপ সমালোচনায় নারদের সরস ভূমিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

'গুরুপত্নী বলি ইন্দু ত্যাগ না করিলা।
সূর জ্যেষ্ঠ নিজ কন্যা আপনি হরিলা।।
গুরু ভার্যা দেবরাজ না করিলা ত্যাগ।
পরাশর না গণিলা বর্ণের বিরাগ।।
হেন দ্রব্যাভিলাষি তোমরা পঞ্চ জন।
কিরূপে সদ্ভাবে কাল করিবে যাপন।।'(১/১)

পুরাণ কাহিনির এই ভূমিকাটুকু নাট্যকার খুব সুন্দর ভাবে নারদের মুখে সংযোজন করেছেন। সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনি বলবার আগে নারদীয় টিপ্পনী দ্রৌপদীকেন্দ্রিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, যদিও নাটকের লক্ষ্য দ্রৌপদী নয় সুভদ্রা। এই প্রসঙ্গে নাট্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ''ইন্দ্রপ্রস্থের অংশটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বারকায় যে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে সেই অংশ থেকেই নাটকের শুরু হওয়া উচিত ছিল।''[৬] মনে হয় তারাচরণ রসিক নারদকে উপেক্ষা করতে চাননি বলেই মূল ঘটনার একটু গোড়া থেকেই কাহিনি শুরু করেছেন। এই প্রসঙ্গেই সুন্দ-উপসুন্দ ভাতৃদ্বয়ের কাহিনি শোনা গেল যা নাটকে 'সিন্ধ-উপসিন্ধ' নামে উপস্থাপিত হয়েছে। সম্ভাব্য ভাতৃবিরোধের আশঙ্কা এড়াতে নারদ পঞ্চভ্রাতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রণয়ন করে দিলেন, নাট্যাংশে যা নারদের সংলাপে উচ্চারিত এবং পঞ্চভ্রাতার দ্বারা স্বীকৃত। কাশীরামের কাব্যেও তেমনি আছে—

''বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবে এক গৃহে।
অন্য জন সেইকালে অধিকারী নহে।।
কৃষ্ণাসহ দেখে যদি ভাই অন্য জনে।
দ্বাদশ বৎসর তবে যাইবে কাননে।।
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণা-সহ বঞ্চে পঞ্চজন।।''[৭]

কালীপ্রসন্নের অনুবাদে অবশ্য দেখা যাচ্ছে নিয়মটি পঞ্চভ্রাতারা পরস্পর নির্ধারণ করেছেন - ''ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে তপোধন নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।''[৮]

ক্রোধে কম্পিত হয়ে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করতে করতে ব্রাহ্মণের প্রবেশ নাটকীয় বটে, কিন্তু নাটকে অর্জুন আর ব্রাহ্মণের কথোপকথন হাসির খোরাক যোগায়।

অর্জুন : মহারাজ যুধিষ্ঠির গৃহ মধ্যে আছেন।

ব্রাহ্মণ : তাহাতে কি?

অর্জুন : এ সময় সে স্থলে প্রবেশ করিতে পারিব না।

ব্রাহ্মণ : সে স্থলে প্রবেশের প্রয়োজন কি। সে স্থানে আমার
গো নাই এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও চোর নহেন।(১/২)

নাটকে ব্রাহ্মণ অভিসম্পাত করে রাজ্য পরিত্যাগের হুমকি দিয়েছেন। কাশীরাম সরল ভাষায় বলেছেন, 'গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।' কালীপ্রসন্ন সিংহের পণ্ডিতেরা মার্জিত ভাষাতেই ব্রাহ্মণের তির্যক বাক্যবাণ বর্ণনা করেছেন। এখানে অর্জুনের সংকটটি লঘু করে দেখানো হয়েছে। একদিকে ব্রাহ্মণের গো ধন উদ্ধার ও অন্যদিকে নিয়ম ভঙ্গের জন্য দ্বাদশ বৎসর বনবাস —এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিই অর্জুন শ্রেয় মনে করেছেন প্রবল কর্তব্য বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে। তবে তিনি নারদের সমালোচনা করেননি, কিন্তু মহাকাব্যিক এই চরিত্রের মুখে নাট্যকার একটি আক্ষেপবাক্য সংযোজন করেছেন—

'কথা শুনি নারদার করিয়াছি অঙ্গীকার
এবে কিসে লঙ্ঘিব তাহায়।।'(১/২)

পৌরাণিক আখ্যানে যেমন কথায় কথায় বনবাস বা রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে থাকে নাট্যাংশটিও সে প্রভাব মুক্ত হলো না। 'অর্জুন আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন' বলে ত্রিপদীতে কিছু লাইন লেখা হলেও সেখানে দ্রৌপদীর জন্য অর্জুনের ব্যকুলতা দেখানোর সুযোগ পৌরাণিক প্রভাবেই বিনষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী যখন একান্তে অস্ত্রাগারে ছিলেন তখন অর্জুন

ব্রাহ্মণের গো-ধন উদ্ধারের জন্য নিয়ম লঙ্ঘন করে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। নাটকে অস্ত্রাগারকে বলা হয়েছে শয়নাগার। মূলে স্পষ্টতই তা উল্লেখ রয়েছে, ''আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময় আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উলঙ্ঘন করিয়াছি।''[৯] সেজন্য অর্জুন পূর্বশর্তানুযায়ী বার বছর বনবসে যাওয়ার উদ্দ্যোগ করছেন। যুধিষ্ঠির আসন্ন এই বিপদ এড়াতে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, না কি না 'জ্যেষ্ঠর গৃহে কনিষ্ঠ ভ্রাতার গমনে হানি নাই' —এই অংশটি মহাভারতের অনুরূপ বটে, তবে অর্জুন যে যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন তা নাটকে সরলীকৃত হয়েছে— 'অঙ্গীকার ভ্রষ্টের জীবনাপেক্ষা মরণই ভালো।' মূল আখ্যানে অর্জুনের প্রত্যুত্তরটি আক্রমণাত্মক—

> ''হে মহারাজ! আপনি কহিয়াছেন, ছলপূর্বক ধর্মানুষ্ঠান করিবে না; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। মহাত্মা অর্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপুরঃসর দ্বাদশবর্ষ বনবাসে যাত্রা করিলেন।''[১০]

এখানে দ্রৌপদী বা ভীম ছিলেন না। নাটকের দ্রৌপদী বিদগ্ধা যাজ্ঞসেনী নন, নিতান্তই বালখিল্য তার আচরণ। তিনি অর্জুনের অঙ্গীকারকে যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইছেন।

অর্জুন : সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।
দ্রৌপদী : লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।
অর্জুন : দোষী হইয়াছি।
দ্রৌপদী : কিসে সন্ধি ভঙ্গ হল।
অর্জুন : তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্মরাজের সনেতে।।
দ্রৌপদী : ছিলাম আমি ধর্মরাজ সহ।
কিসে তাহে সন্ধি ভঙ্গ হল তাহা কহ।।(১/৩)

বার বৎসরের জন্য অর্জুনের বনে গমনের বিষয়কে কেন্দ্র করে দ্রৌপদীর মনে সম্ভব্য বিচ্ছেদ বেদনার চিত্র নাটকে দেখানোর সুযোগ ছিল। নাট্যকারের সে দক্ষতা ছিল না বলেই প্রতিনায়িকার ভূমিকায় দ্রৌপদীকে দেখা গেল না। আর ভীম বহুবার তাদের পরিজনকে রক্ষা করেছেন ভয়ানক সব পরিস্থিতি থেকে; সেই সূত্রেই যেন ভীমের আগমন ঘটল। অর্জুন যেন

দায়িত্বভার থেকে নিজেকে discharge করে নিয়ে ভীমের ওপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। কুন্তী সংলাপহীন ভাবে উপস্থিত থেকে কেবল বিদায়ী প্রণাম গ্রহণ করলেন।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে বসুদেবের সঙ্গে দেবকি ও রোহিণীর হেয়ালিপূর্ণ কথোপকথন নাট্যকারের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত। এই অংশে দেখা যায় বিবাহযোগ্যা কন্যার পরিবারের একটি প্রতিচ্ছবি। উদাসীন পিতাকে কন্যার বিবাহ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বাঙালি মায়ের দুশ্চিন্তার চিরাচরিত দৃশ্য বিস্তর ভনিতার পর মূল প্রসঙ্গে এসেছে। মহাকাব্যের অন্তপুরকে আটপৌর গার্হস্থ্য বাঙালির গৃহকোণে এনে ফেলেছেন নাট্যকার। নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিলেও লেখক বাংলার স্বভাবধর্মের তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে আধুনিক বাঙালীসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের দুশ্চিন্তা, অন্তপুরিকাদের প্রবাদ-সংস্কারাশ্রিত আলাপ, বিবাহের প্রথা ও স্ত্রী-আচার ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালী সমাজের বাস্তব পরিবেশ নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠক ও দর্শকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষক ও আমোদপ্রদ হইতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই।''[১১]

সুকুমার সেন মহাশয় ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বাঙালির চালচিত্রের দিকটাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, ''অন্তঃপুরিকাদের চিত্রে ঐতিহাসিকতা ক্ষুন্ন হইয়াছে, তবে বাঙ্গালি ঘরের ছবি বলিয়া লইলে মন্দ নয়।''[১২] বাস্তবিক বাঙালির মানস ক্ষেত্রে মহাকাব্যের সুবিশাল মহীরুহকে ঘরোয়া আঙ্গিকে পরিবেশনের পুরোধা কৃত্তিবাস-কাশীরাম এবং পালাগায়েনেরা। তারই প্রভাবে নাটকে দেখা যায় মূলকথা বলবার আগে বক্তাগণ বিস্তর ভনিতা করছেন। দেবকী ও রোহিণী যেমন করেছেন, বসুদেব বলদেবকেও তেমন ভনিতা করতে দেখা যায়।

বলদেব : মনঃপীড়ার হেতু কি?

বসুদেব : তোমাদিগের জননীদ্বয়।

বলদেব : জননীদ্বয় হইতে কি মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইতেছেন।

বসুদেব : তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরষ্কার করিয়াছেন।

বলদেব : হে পিতঃ ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বসুদেব : তাহার কারণ সুভদ্রা। (২/২)

—এতক্ষণ কথাবার্তা হয়ে গেল তাও আসল কথাটি প্রকাশ পেল না।

সুভদ্রা হরণ প্রসঙ্গে মূল আখ্যানে বলরামকে দেখা যায় অনেক পরে। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করার পর যাদববীরেরা যখন আস্ফালন করছেন তখনও বলরাম কৃষ্ণের মুখ চেয়ে আছেন। বলরাম বললেন, ''হে বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌনভাবে রহিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা কিংবা তর্জন-গর্জন করা সকলই বৃথা; বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ? মহামতি বাসুদেব প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, পরে ইঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিবে।''[১৩] অবশ্য তারপরে বলরামই অর্জুনের এহেন স্পর্ধার কথা উল্লেখ করে ক্রোধদৃপ্ত স্বরে বললেন, ''আমি একাকীই অদ্য এই বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরব করিব, অর্জুনের এই ব্যতিক্রম আমি কখনই সহ্য করিব না।''[১৪] নাটকে বসুদেব জেষ্ঠ্যপুত্র বলরামের সঙ্গেই সুভদ্রার বিবাহের আলোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বলরামের ওপরই ভরসা করেন—

'তুমি বাপু জ্যেষ্ঠ পুত্র কি কব তোমারে।
তাহে অতি বুদ্ধিমান সকল প্রকারে।।' (২/২)

বলাবাহুল্য বলরাম সম্পর্কে এই উক্তি অতিবাৎসল্যপূর্ণ। বাস্তবিক বলরামের বুদ্ধি নিতান্তই সহজ সরল, কৃষ্ণের তুলনায় তো নয়ই। নাটকে সুভদ্রার বিবাহ সর্ম্পকিত আলোচনাটা বসুদেব এবং বলরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে, গোপনীয়তা রক্ষা করেছে। কাশীরামে এই গোপনীয়তা নেই, সেখানে সরাসরি মিটিং বসেছে সকলকে নিয়ে।

''প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান-দান।
একত্র বসিল সব যাদব-প্রধান।।
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রুর সারণ গদ মুষলী মাধব।।''[১৫]

কৃষ্ণ তো পাত্র হিসেবে অর্জুনকে মনোনীত করে প্রায় সকলকে তার মতের সপক্ষে নিয়ে এসেছেন, ফোঁস করে উঠলেন বলরাম—

''এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর।।
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা-কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে।।
কৌরবকুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন।
উচ্চ কুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন।।''[১৬]

সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গে দুর্যোধনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন কাশীরাম। ফলে যে স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটল সেখানে নাটকীয়তার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। তাই তারাচরণের নাটকে বলরাম যথেষ্ট জায়গা পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যদুপুরীর অন্তপুরের নারীদের বাক্‌বিতণ্ডার চিত্রটি সম্পূর্ণই নাট্যকারের মৌলিক চিন্তার ফসল। একদিকে বলরাম মাতা রোহিণী ও অপর দিকে কৃষ্ণ জননী দেবকীর পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য জামাতা দুর্যোধনের অপকীর্তি এবং ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক তুলে ধরা হয়েছে। সুভদ্রার পাত্র নির্বাচন সম্পর্কে রোহিণী দেবকীর মধ্যে যে পার্থক্য সেখানে নাট্যকারের দৃষ্টি পড়লেও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তা ততটা জীবন্ত হয়ে উঠেনি। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের খোঁটায় রোহিণী শেষ পর্যন্ত যদুর পিতা যযাতির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, 'তুমি কহিতেছ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ; ভাল, তাহার একটা অঙ্গ বই তো হীন নয়। কিন্তু যযাতির কি পর্যন্ত দুরবস্থা না হইয়াছিল। পৃথিবীর তাবৎ রোগ তাহার শরীরে নিবাস করিত, তাহার সকল অঙ্গ ক্ষত এবং পাপ রোগে পরিপূর্ণ ছিল। যদ্যপি ধৃতরাষ্ট্র কেবল অন্ধ হওয়াতে দুর্যোধন দোষী, তবে তোমার মতে যযাতি বংশীয় কন্যা সুভদ্রা তাহা হইতেও অধম, ইহাতে দুর্যোধনকে সম্প্রদান করণের হানি কি?'(২/৩) রোহিণীর এই যুক্তি বহু কষ্টে আহৃত। যযাতি শুধু যদু বংশের নয়, পুরু বংশেরও আদি পিতা এবং যযাতির কাহিনিকে পেতে গেলে আরও বহুকাল পিছিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে রোহোণীর এই যুক্তি কেবল বক্তব্যকে প্রলম্বিত করে।

নারী সুলভ সহজাত কলহ এটা নয়। কাশীরামে অবশ্য দেবকী-রোহিণী দুজনেই কৃষ্ণের মতে সায় দিয়েছেন, কলহের আবকাশ দেন নি। রোহিণী বলরামকে বলছেন—

''কি-হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জুনেরে ভদ্রা, সবাকার মন।।
সাধু ধর্মশীল পার্থ, গুণী সর্ব্ব গুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে।।
যে কহ, সে কহ তাত, ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থরে সুভদ্রা দিব আমি।।''[১৭]

তৃতীয় অঙ্কের কাহিনি শুরু হয় অর্জুনের প্রাভাস তীর্থে আগমনের সংবাদে। প্রভাস তীর্থ থেকে দ্বারকা খুব বেশি দূরে নয় বলে এই সংবাদ খুব সহজেই কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যায় এবং কৃষ্ণ আসেন অর্জুনকে নিয়ে যেতে। এক্ষেত্রে নাট্যকার দূত হিসেবে দারুককে কল্পনা করে নিয়ে ছোটো ছোটো দুটি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হওয়ার পরই কৃষ্ণ সকলের কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন, 'যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, এবং আমার পিতৃস্বসা কুন্তীঠাকুরানী, ইহারা কেমন আছেন?'(৩/৩) —লক্ষণীয়, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দ্রৌপদীর কথা উল্লেখ করলেন না। এটা তাঁর কাছে আশা করা যায় না। দ্রৌপদীর নাম উল্লেখে সুভদ্রার প্রাধান্য কমে যেত না! অর্জুনের আগমন উপলক্ষে রৈবর্তক পর্বতে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়। কাশীরাম তা পয়ারে বর্ণনা করেছেন—

''কৃষ্ণ বাক্য শুনিয়া দ্বারকাবাসী সব।
রৈবর্তক পর্বতে করয়ে মহোৎসব।।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা আর নর-নারীগণ।
নানা বাদ্য-নৃত্য-গীত করে অনুক্ষণ।।''[১৮]

নাটকে সুভদ্রার কথায়—

'নর্তকী করিছে নৃত্য গায়কেতে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্তিমান।।'(৩/৪)

পৌরাণিক নাটক রূপে এই দৃশ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নৃত্যগীতের অবতারণা করা যেত, এক্ষেত্রে মহাভারতের অনুমোদনও ছিল কিন্তু নাট্যকার সচেতন ভাবেই তা বর্জন করেছেন। নাট্যকার 'ভদ্রার্জুনে'র বিজ্ঞাপন অংশে নাটকে গানের ব্যবহার সম্পর্কে বিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, ''কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে'[১৯] —এটা তাঁর পছন্দ নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে নৃত্যগীত সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করত না, নাটকের আবহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। বরং নাট্যকার মাতালের কণ্ঠে যে গান সংযোজন করেছেন তা নাট্যকাহিনির কোনো উপকার সাধন করেনি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''পরবর্তীকালে বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে সঙ্গীত-প্রাধান্য দেখা যায় 'ভদ্রার্জুনে' তা নেই। এর কারণ প্রথমতঃ নাট্যকার পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তখনও কোনো গীতাভিনয় রচিত হয়নি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশ এবং নান্দী সূত্রাধার নটী ইত্যাদি বাদ যাওয়ায় নাটকে গান কম।''[২০]

বস্তুত নাটকে dramatic relif সৃষ্টির জন্য সেকালের দর্শকদের রুচির প্রতি নজর রেখেই মাতাল-বাতুলকে নাট্যকার তাঁর নাটকে নিয়ে এসেছেন। সুরেশচন্দ্র মৈত্র এ সম্পর্কে বললেন, ''এ হোল সে-যুগের কালুয়া-ভুলুয়ার নবীন সংস্করণ।''[২১]

কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে একই রথারূঢ় দেখে পথিক সাধারণের মধ্যে কৃষ্ণার্জুনকে সনাক্ত করা নিয়ে যে মত ভেদ দেখা দেয় তার সূত্রও কাশীরামে রয়েছে—

> ''কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় আরোহণ এক রথে।
> দোঁহে এক মূর্ত্তি, কেহ না পারে চিনিতে।।
> দোঁহে নীলঘনশ্যাম অরুণ-অধর।
> কিরীট-কুণ্ডল-হার শোভে পীতাম্বর।।
> কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ, পার্থে বলে হরি।
> দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নরনারী।।''[২২]

সুভদ্রা হরণ প্রসঙ্গে সত্যভামার উপস্থিতি মূল আখ্যানে নেই কিন্তু কাশীরামের পাঁচালিতে বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত। এই অঙ্কের তৃতীয়-চতুর্থ দৃশ্যে সত্যভামা সুভদ্রার কৌতুহল নিবারণের জন্য কৃষ্ণসখা অর্জুনের বীরত্ব ও পূর্বকাহিনি বর্ণনা করলেন। অর্জুন সম্পর্কে সুভদ্রার মন্তব্যগুলি লক্ষণীয়—

'কুন্তী ঠাকুরানী কেন হেন আজ্ঞা দিল।
পঞ্চভাই এক নারী বিবাহ করিল।।'(৩/৪)

'কিন্তু পাণ্ডবেরা কিরূপে বিবাহ করিলেন, আর দ্রৌপদীই বা কেমন, যে পঞ্চভর্তৃতে অনুরক্ত হইলেন।'(৩/৪) —সুভদ্রার এরূপ সমালোচনা নাটকে নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

অর্জুনের রৈবর্তক পর্বতে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে সুভদ্রা-অর্জুনের সাক্ষাৎ হয় বলে নাটকে এবং কাশীরামের পাঁচালিতে বর্ণিত হয়েছে। মূলত উৎসব হয়েছিল দুটি। প্রথমটি অর্জুনের আগমন উপলক্ষে, দ্বিতীয়টি রৈবর্তক পর্বতেই দ্বারকাবাসীর বাৎসরিক উৎসব। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বর্ণনা দিয়াছেন এইভাবে—

> ''দ্বারকাবাসীরা তাঁদের বাৎসরিক উৎসব পালন করেন এই পর্বতেই। অর্জুন দ্বারকায় থাকতে-থাকতেই সেই উৎসবের সময় এসে গেল এবং দ্বারকাবাসী বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজকুলের প্রধান-পুরুষেরা পাহাড়ে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। দ্বারকায় এই সময়টা খুব ভাল সময়। উৎসব উপলক্ষে পাহাড়ে নতুন অস্থায়ী আবাস গড়ে উঠল; সেগুলি সাজানো হল চিত্রবিচিত্র উপকরণে। দেখলেই উৎসবের পরিবেশ মনে আসে। বাজনদারেরা বাদ্যি নিয়ে গেল, নাচিয়েরা নাচের মহড়া দিতে আরম্ভ করল, গাইয়েরা গানের গলা খুলে দিল উৎসবের আমেজে—ননৃর্তুনর্তকাশ্চৈব জগুর্গেয়ানি গায়নাঃ। উৎসব উপলক্ষে দ্বারকার সমস্ত লোকজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে— কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রথে, কেউ বা সুবর্ণমণ্ডিত যানে রৈবতকে চলে এসেছেন। যদু-বৃষ্ণিদের মেয়ে-বউরাও এসেছেন সালঙ্কারে, হাবে, ভাবে, লাস্যে।''[২৩]

নাটকে এবং কাশীরামের কাব্যেও এই দুই অনুষ্ঠান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এই অনুষ্ঠানেই অর্জুন সুভদ্রাকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং সুভদ্রাকে লাভ করার জন্য কৃষ্ণের পরামর্শ চেয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ থেকে এই অংশটি দেখা যাক— রৈবর্তক পর্বতে

অবস্থান কালে আয়োজিত উৎসবানুষ্ঠানে অর্জুন দেখতে পেলেন, ''সখীজনপরিবৃতা সর্বালঙ্কারশোভিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী বাসুদেবদুহিতা সুভদ্রাকে।''[২৪] অর্জুনের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বললেন, ''যদি তোমার মন নিতান্তই ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে তবে বল, আমি এই কথা পিতার কর্ণ গোচর করি।''[২৫] অর্জুন কী উপায়ে সুভদ্রাকে লাভ করতে পারবেন তার প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বললেন, ''হে অর্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবর কাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কারণ, স্বয়ংবরে সে কাহার প্রতি অনুরক্তা হইবে কে বলিতে পারে?''[২৬] কিন্তু কাশীরাম মূল কাহিনিকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন, সেখানে অর্জুন নয়, সুভদ্রাই অর্জুনের প্রেমে পড়েছেন এবং সেই প্রেম ঘটিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে একেবারে স্নেহময়ী বাঙালি বউদির ভূমিকায় নামতে হয়েছে, নাটকেও তাই। কাশীরামের কাব্যে অর্জুনকে প্রথম দর্শনেই সুভদ্রা মূর্ছা যান —

''অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূচ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত।।''[২৭]

নাটকে এই মূর্ছা দৃশ্যায়িত হয়নি তবে সত্যভামা যখন শ্রীকৃষ্ণকে সুভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্যের কথা বলছেন তখন তা বর্ণনাত্মক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে —

'যখন অর্জুন সনে এলে প্রভু নিকেতনে
সেই ক্ষণে সুভদ্রা অজ্ঞান।।
অর্জুনেরে রথে হেরি লজ্জা ভয় পরিহরি
বিচলিতা তাহার কারণ।'(৩/৭)

মূল আখ্যানে সত্যভামা অনুপস্থিত নাটকে সত্যভামা ঘটকের কাজ করেছেন। সত্যভামার সঙ্গে কথোপকথনে সুভদ্রার মনোবৈকল্য ধরা পড়েছে—

সুভদ্রা : সত্যভামে, আর আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে কহিও না।

সত্যভামা : কেন, ভদ্রে, একথা কহিলে কেন?

সুভদ্রা : সখি, আর সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

সত্যভামা : কেন লো সুভদ্রে তুই হইলি চঞ্চল।
কি হেতু হঠাৎ মন হইল বিকল।।
এই যে আমোদে ছিলি অর্জুনে দেখিতে।
এমনি হইলি কেন দেখিতে দেখিতে।।(৩/৬)

প্রথম দর্শনেই নায়িকার তীব্র ব্যাকুলতা বৈষ্ণবীয় অনুরাগে রঞ্জিত। সুভদ্রা এতই অস্থির হয়ে উঠেছেন যে একরাত্রিরও অপেক্ষা করতে রাজি নন —

'এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে।
ইহার মধ্যেতে প্রাণ যায় পাছে।।
তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল।
কি হবে আহুতি দিলে নিভিলে অনল।।'(৩/৬)

কাশীরামের সুভদ্রা অবশ্য রাত্রিবেলায় অর্জুনের সঙ্গে মিলনের আশ্বাসে আনন্দিতই হয়েছেন—

''সত্যভামা বলে, দেবি, চল এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থসহ করাব মিলন।।
সত্যভামা মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে হইয়া হরষ।।''[২৮]

মূল আখ্যানে সুভদ্রার পক্ষ থেকে কোনো রূপ চিত্ত চাঞ্চল্য ছিল না, তা সম্পূর্ণ ভাবেই ছিল অর্জুনের পক্ষ থেকে। রৈবর্তকে আয়োজিত উৎসবানুষ্ঠানে অর্জুনের তৃষ্ণার্ত হৃদয়-ই প্রথম আবিষ্কার করেছে সুভদ্রাকে এবং কৃষ্ণের কাছে কৌতুহল প্রকাশ করেছে। মূল আখ্যানে ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য্য প্রাধান্য পেয়েছে, প্রেম মাধুর্য অবিকশিত থেকে গেছে।

অতপর সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমুদয় বিবরণ দিয়ে সম্ভাব্য পরিস্থিতির সমাধানের জন্য পরামর্শ করেছেন। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ দায়িত্ব সত্যভামার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। মূল আখ্যানে

অর্জুন তো সরাসরিই কৃষ্ণকে বলেছিলেন তাই সেখানে সত্যভামার প্রয়োজন পড়ে নি। নাটকে কৃষ্ণের মনে সামান্য দ্বিধা দেখা দিয়েছে, অর্জুন যদি ভয়ে স্বীকার না করেন কৃষ্ণ-বলরামের ভগ্নী বলে—

'অর্জুনে কহিতে কিন্তু নাহি করি ভয়।
স্বীকার না করে পাছে এ সন্দেহ হয়।।
না করে গ্রহণ মম স্বসা বলি পাছে।
এই মাত্র সন্দেহ আমার মনে আছে।।'(৩/৭)

মূল আখ্যানে অবশ্য কৃষ্ণের আশঙ্কা ছিল সুভদ্রা বিষয়ে, ''স্ত্রী লোকের প্রবৃত্তির কথা বলা যায় না; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।''[২৯] গান্ধর্ব বিবাহের প্রসঙ্গটি মূল আখ্যানে নেই। কাশীরামের পাঁচালীতে বর্ণিত গান্ধর্ব বিবাহের পূর্বে অর্জুন ও সত্যভামার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে রসাত্মক কথোপকথন পাই তা নাটকে বর্জিত হয়েছে। পাচাঁলিতে দ্রৌপদী সম্পর্কিত খোঁটা দিতে সত্যভামা ছাড়েননি এবং অর্জুনও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জবাব দিয়েছেন—

''পঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি-গাছ।
তিল এক পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ।।
যে-লোভে নারদবাক্য করিয়া হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন।।
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয়।।''[৩০]

—এখানে অর্জুনকে সত্যভামা তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। নারদবাক্য হেলন করে বনে বনে ঘোরার কথায় স্পষ্টতই উলুপী ও চিত্রঙ্গদার প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ করেছেন। কেননা ওই দুই কন্যাতো অর্জুনকে চিরতরে আটকে রাখেন নি, তারা নির্দিষ্ট সময়ের পর অর্জুনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যে একেবারে 'বিভা' করতে হবে তাও আবার শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ভগ্নী সুভদ্রাকে। নাটকে অর্জুনকে এইখানে কামুক করে দেখানোর ফলে সত্যভামার তাতিয়ে তোলা প্রসঙ্গের দরকার হয়নি। সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের প্রথম সম্ভাষণে বারাঙ্গনার প্রতি

কামাতের্র কণ্ঠ শোনা যায়। অর্জুন সুভদ্রার হাত ধরে বললেন, 'এসো প্রিয়তমে, আমার দুঃখরাশি নাশ কর। মন্মথ বাণানল আমার বক্ষস্থল দগ্ধ করিতেছে, এসো—স্পর্শ করিয়া শীতল হই।'(৩/৮) অথচ তখন সত্যভামা উপস্থিত রয়েছেন! কাশীরাম কিন্তু সত্যভামাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সুভদ্রাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দ্বিতীয় বার সুভদ্রাকে একা পাঠিয়েছেন।

''নাহি নাহি করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন, ছাড় ছাড় ডাকে।।
ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার।।
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিৎ-সুতা।
কহ পার্থ, গণ্ডগোল কে করিছে হেথা।।''[৩১]

কাশীরামে অর্জুনের সম্বোধন 'বিদ্যাসুন্দরের' কামনায় দগ্ধ নয়—

''আইস আইস বৈস, ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন-পূর্ণ-চন্দ্রমা নিরখি।।''[৩২]

সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন কামার্ত হলেও যখন জানলেন ইনি কৃষ্ণের ভগ্নী তখন অর্জুনের মনে ভয়ও যুগপৎ কাজ করছিল, কিন্তু নাট্যাংশে অর্জুনের কৃষ্ণভীতি এতটাই বেশি যে নায়কোচিত মহিমাকে ম্লান করে। সুভদ্রাকে কৃষ্ণের ভগ্নী বলে জ্ঞাত হওয়ার পর অর্জুন যেন হঠাৎ চাবুক খেয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন— 'হে সত্যভামে, তুমি কি পাণ্ডবকুলের নিধন জন্য এই কামিনীকে আনয়ন করিয়াছ? যদ্যপি নারায়ণ এ সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে পাণ্ডবদের আর রক্ষা নাই; তিনি কোপান্বিত হইলে কে রক্ষা করিবে? অতএব তোমরা গমন কর, আমি নিদ্রা যাই।'(৩/৮) অতপর সত্যভামা অর্জুনকে অভয় প্রদান করে 'গান্ধর্ব বিবাহ নির্বাহ' করেন— নাটকে উল্লেখ মাত্র হয়েছে, তা নাট্যিক ক্রিয়ার দ্বারা উপস্থাপন করেন নি। কাশীরামে তবু একটু আয়োজন দেখা যায়—

''পাঁচ-সাত সখী মিলি দিলা হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিলা তুলি।।''[৩৩]

বলদেবের সভায় কাশীরাম সব যাদব প্রধানদের একত্রিত করেছেন সুভদ্রার বিবাহ প্রসঙ্গে—

''উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ মুষলী মাধব।।''[৩৪]

নাটকের প্রয়োজনে তা সংক্ষেপিত হয়ে নারদ ও বলদেবে চরিত্রের মধ্যে সীমায়িত হয়েছে। মূল বক্তব্য অবশ্য একই। তবে এই বৈঠকের গোপনীয়তা ও নারদ চরিত্রের ইন্দন-সুলভ কথা লক্ষণীয়— 'কি প্রভো হলধর, কি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ পদে পদে আপনার অপমান করিবেন। আপনি এখনও নিশ্চিন্ত আছেন। আপনি আমার অতি প্রিয় পাত্র, আমি আপনার অপমান দেখিতে পারি না, অতএব সংবাদ দিতে আসিয়াছি।'(৩/৯) দুর্যোধনকে সুভদ্রার পাত্র রূপে মনোনীত করার সংবাদটি নারদ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

''অর্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে। বা
তিন-লোকে বিখ্যাত, পাণ্ডব জারজাত।
হেন জনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত।।''[৩৫]

কাশীরামের এই লাইনগুলি নাটকে পাওয়া যায় —

'পান্ডব জারজ গোষ্ঠী কে বা নাহি জানে।
অর্জুন কি সমযোগ্য হবে দুর্যোধনে।।'(৩/৯)

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যে যথাক্রমে হস্তিনাপুরের ধৃতরাষ্ট্রের সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভা ও হস্তিনার রাজবর্তে বরযাত্রীদের বিবরণ কাশীরামের আখ্যানের অনুরূপ। এই অংশে শকুনি, কর্ণ এবং বিশেষত ভীম চরিত্রটি দু'একটি সংলাপের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে। বিবাহ উপলক্ষে যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা নিয়ে শকুনি কর্ণ দুঃশাসনাদির মধ্যে যে সংলাপ রয়েছে তা নাট্যকারের মৌলিক ভাবনা। এই অঙ্কের প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্য গদ্য ভাষায় রচিত হওয়ায় তা অনেকটা নাটকের উপযোগী হয়েছে। কাশীরাম অতশত কথায় যাননি, সরল ভাবে বলেছেন —

''দুর্যোধন দূত পাঠাইল ধর্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ-কারণে।।''[৩৬]

দুঃশাসনেরা যেন একটু বিনম্র ভাবেই নাটকে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি ভীমকে স্বাগত জানাচ্ছেন এভাবে, 'হাঁ ভ্রাতঃ ভীম, সব উদ্‌যোগ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, কেবল তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলুম।' কিন্তু ভীম ব্যঙ্গাত্মক ভাবেই বললেন, দ্বারকা তো অনেক দূরে এত আগে থেকেই বরসজ্জার প্রয়োজন নেই। ভীমের এই মন্তব্য নিয়ে অন্যান্যদের সংলাপ লক্ষণীয়, বিশেষত কর্ণ ও ভীষ্মের মধ্যে যে সবসময় একটা বিরোধ লেগে থাকত তাও এই দুটি সংলাপে বোঝা যায়—

কর্ণ : উহার অশুভসূচক কথায় কি হইবে? কেবা উহার বাক্য গ্রাহ্য করে।

ভীষ্ম : ভীম অত্যন্ত অন্যায় বলে নাই, এখনও পথ অনেক আছে বটে!

কর্ণ : চিরকালেই পাণ্ডবেরদের পক্ষে ভীষ্মের স্নেহ।(৪/৩)

কাশীরামে ভীষ্ম ও কর্ণের মধ্যে এই প্রসঙ্গে কোনো বাদানুবাদ নেই।

''ভীষ্ম বলে, দুর্যোধন পাবে লজ্জা-মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা, মোরা বরযাত্র।।''[৩৭]

পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে দেখা যায় সত্যভামা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে এসেছেন কেননা বলরামের কথামত দুর্যোধনেরা সদলবলে আসছেন। বিবাহিতা সুভদ্রার পুনর্বিবাহের আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্ন এবং আরও একটি সম্ভাবনার কথায় তিনি শঙ্কিত, 'আর প্রভো, ইহার কি পরামর্শ করিবেন, এই সুভদ্রার কারণ কত লোকের জীবন নাশ হইবে, তাহা বলিতে পারি না; দেখিতেছি এই রৈবত পর্বত শোণিতে প্লাবিত হইবে।'(৫/১) আসন্ন যুদ্ধে রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা সত্যভামা চরিত্রকে একটু মর্যাদা প্রদান করে।

সুভদ্রা ও সত্যভামার কথোপকথনের মাধ্যমে নায়িকার মনের ব্যকুলতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে নাট্যকার বিলাপ করে ফেলেছেন। সুভদ্রার হাহাকার প্রেমিকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রোমাঞ্চিত হয়ে মর্মস্পর্শ করে না। সুভদ্রাকে শান্ত করার জন্য সত্যভামার যে সকল কথা ত্রিপদীতে বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যান্ত্রিক।

সুভদ্রা হরণের সংবাদে দুর্যোধন ম্রিয়মায় হয়ে পড়েছেন। দুর্যোধনোচিত ক্রোধ না থাকায় নাটকের প্রত্যাশা ব্যাহত করেছে—

‘নয়নের নীর আমি কি রূপে নিবারি।
দুঃখের বচন আর কহিতে না পারি।।’(৫/৮)

কাশীরাম কিন্তু একটু হুঙ্কার দিয়েছেন—

‘‘শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্যোধন উঠিল গর্জিয়া।।’’[৩৮]

ভীষ্মের কাছে ভীমের কৈফিয়ত অর্জুনের নায়কোচিত মহিমাকে ক্ষুন্ন করে। ‘পিতামহ, আপনি দেখুন, দুঃশাসন এখন অর্জুনসহ যুদ্ধ করিতে চাহে, ভাল অর্জুনের দোষ কি? কৃষ্ণ আপনি তাঁহাকে ভদ্রা প্রদান করিয়াছে, তিনি তো স্বইচ্ছায় হরণ করেন নাই।’(৫/৮) এই অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে দারুকের কাছেও অর্জুন একই রকম ভাবে কৃষ্ণের দোহাই টেনেছেন, ‘এক্ষণে বলদেবের ইচ্ছা, ভদ্রাকে দুর্যোধনের হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু তাহা হইলে কৃষ্ণ লজ্জা পাইবেন, তন্নিমিত্ত আমি সুভদ্রাকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিব।’(৫/৭) বস্তুত কৃষ্ণের প্রাধান্য এতটাই বেশি দেয়া হয়েছে যে নাটকে কৃষ্ণানুগত অর্জুনকে ছায়া মাত্র মনে হয়। কাশীরামে অন্তত যুদ্ধের অংশটায় অর্জুনকে সক্রিয় হতে দেখা গেছে। যুদ্ধপরিস্থিতি বর্ণনায় রথের গতি ধরা পড়েছে—

‘‘পাশ-অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রণস্তম্ভে আপন দক্ষিণে।।
এক পদে কড়িয়াল, আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি।।
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে।।’’[৩৯]

কর্ণের সংলাপে ক্ষাত্রোচিত দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে যদিও তা দুঃশাসনের মন্ত্রণায় প্রশমিত হয়েছে।

নবম দৃশ্যে দূত বলরামের কাছে সংবাদ বহন করে এনেছেন কিন্তু বিস্তর ভনিতার পর মূল সংবাদ প্রকাশ করেছেন এতে নাটকের গতি কমে গেছে, বিশেষত যখন গুরুতপূর্ণ একটি সংবাদ। বলাবাহুল্য দূত বিদূষক নয়, এক্ষেত্রে কাশীরামের দূতের দূতধর্ম প্রশংসনীয়—

''উর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্তা কান্দিতে কান্দিতে।
নাহি আর রক্ষা প্রভু অর্জুনের হাতে।।
সুভদ্রা চালায় রথ, না পাই দেখিতে।
কখনো আকাশে উঠে, কখনো ভূমিতে।।''[৪০]

আরাব যেহেতু সমস্ত যুদ্ধটাই নেপথ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে দূতের বর্ণনভঙ্গির উপরই নানা রকম কলাকৌশল অবলম্বন করে তা প্রকাশের দায় বর্তায়। এছাড়াও মঞ্চের সীমাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধ দেখানোর অসুবিধা নিশ্চয় রয়েছে তাই দূত চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের দূত অতটা পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয় নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে বলরামের তীব্র অভিমান ব্যক্ত হয়েছে। যদিও তা নাট্য সংলাপের অঙ্গিকে নয়, ত্রিপদীর দীর্ঘ ভাষণে।

'দিয়া আপনার রথ অর্জুনে দেখায় পথ
হরিবারে মম সহোদরা।
কৃষ্ণের সাহস পায় অর্জুন হরিল তায়
সতত কৃষ্ণের এই ধারা।।'(৫/১০)

সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও বলরামকে টেক্কা দিয়ে কৃষ্ণের দাদাগিরি তার পক্ষে অপমানজনক। বস্তুত বলরাম কোনো দিনই কৃষ্ণের প্রাধান্যকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এইখানে একটু ট্র্যাজিক সুর মিলেছে। নাটকে নায়ক হিসেবে অর্জুনের চাইতে কৃষ্ণ এবং বলরামের মধ্যে যে স্নায়ু যুদ্ধ চলেছে তারই প্রাধান্য বেশি। কাশীরামের আখ্যানে কৃষ্ণ বলরামকে নানা যুক্তি কৌশলে শান্ত করেছেন।

''কিন্তু কি দোষ করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী-কর্ম্ম দেখ মহাশয়।।
অর্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ।।''[৪১]

কিন্তু, নাটকে সে অবকাশ দেয়া হয় নি। তারাচরণ বলরামের আক্ষেপ উক্তিতেই নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

মহাভারতীয় আখ্যানের উপর ভিত্তি করে তারাচরণের নাটকের কহিনি বিন্যাস মূল থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হয়নি। অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী নাটকের প্লটকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হলে তারাচরণ তাঁর 'ভদ্রার্জুন' নাটকের যে কাঠামো তৈরী করেছেন তা নিঃসন্ধেহে উচ্চ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। দ্রুত ঘটনা প্রবাহ ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চরিত্র সমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানোর অবকাশ নাটকে যথেষ্ঠই ছিল, কিন্তু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি আমাদের আশাহত করে। অবশ্যই একথাও বিচার্য যে বাংলা নাটকের কোনো আদর্শ নাট্যকারের সামনে ছিল না। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় একটু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই কিছুটা প্রশংসা করেছেন—

> ''বাংলা নাটক রচনার প্রথম প্রয়াসের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে ইহার পূর্ণাঙ্গ কৃতিত্ব আশা করা যাইতে পারে না। তবে তিনি তাঁহার নাটকের বিষয়-নির্বাচনে, নির্বাচিত বিষয়ের একটি সুসংহত নাট্যরূপ দানে এবং সর্বোপরি তাঁহার সুবিন্যস্ত নাট্যকাহিনীর মধ্যে পূর্ণতর সাফল্যের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের গৌরব হইতে তাহাকে কিছুতেই বঞ্চিত করিতে পারা যায় না।''[৪২]

নাটকে অর্জুন চরিত্রে নায়কোচিত কোন প্রধান্য দেখা যায় না। বরং সুভদ্রাকে দেখে হঠাৎই কামার্ত হয়ে ওঠাটা তার চরিত্রের হানী ঘটায়। নয়িকা সুভদ্রাও সত্যভামার কাছে নির্লজ্জ আসক্তি প্রকাশ করেছেন। প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংকুল অভিব্যক্তি দেখানোর সুযোগ থাকলেও নাট্যকার তা উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন। সত্যভামার ক্রিয়াকর্ম অনেকটা যান্ত্রিক। ''ভাজ হিসাবে সত্যভামার ভূমিকা একটু ঘোরালো হইয়াছে, সত্যভামাকে দূতী বলা চলে।''[৪৩] সুভদ্রা-অর্জুনের মিলন যেন মহাভারতের কাল থেকেই সিদ্ধ, তাই প্রতি নায়ক হিসেবে দুর্যোধন যেন প্রথম থেকেই ব্যর্থ ছক কষেছেন। বলরাম চরিত্রটি বিকাশের সম্ভাবনা ছিল সবচাইতে বেশি। বড় ভাই হয়েও কৃষ্ণের কাছে হেরে যাওয়া নাটকের শেষে prestigious issue হয়ে

দাঁড়িয়েছে, সহোদরা সুভদ্রাকে অর্জুন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে বলে নয়। কনিষ্ঠের কাছে জ্যেষ্ঠের পরাজয়ের গ্লানিতে বলরামের অভিমান ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণের ভূমিকা মহাভারতের অনুরূপ ভাবেই নাটকে রয়েছে। ভীম চরিত্রটি দু'একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে নাটকে উপস্থিত। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলি— দুর্যোধন, দুঃশাসন, ভীষ্ম, বসুদেব, দেবকী, রোহিণী প্রমুখেরা নাটকে স্বতঃস্ফুর্ত ভবে প্রকাশিত হয়নি। এই নাটকের চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

> ''মহাভারত হইতে কাহিনীটি গ্রহণ করিয়া তারাচরণ ইহার একটি বাহির হইতে নাট্যরূপ দিয়াছেন, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া ইহাকে পুরাপুরি নাটক গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই— সেই জন্যই ইহাতে চরিত্রসৃষ্টিও সেই পরিমাণেই অপরিস্ফুট বলিয়া বোধ হইবে।''[৪৪]

সুরেশচন্দ্র মৈত্র নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের চরিত্রের ছায়া দেখতে পেয়েছেন, ''নাটকে চরিত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে বিচিত্রিত।''[৪৫] তিনি আরো বলেছেন—

> ''এ নাটকের প্রাণধর্ম বিদ্যাসুন্দরীয় সাহিত্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত . . . লেখক নতুন প্রণালীতে নাটক রচনা চেয়েছিলেন, প্রণালীটি নতুন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নাটকের মর্মবস্তু নতুনত্বে তত মর্মরিত হয়নি। বহিরঙ্গে এ-নাটক আধুনিক, অন্তরঙ্গে মঙ্গলকাব্যীয়, মধ্যযুগীয়।''[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে এ নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন নাট্যসমালোচকেরা বহুবিধ অভিযোগ অনুযোগ করেছেন এবং তা অস্বীকার কারারও উপায় নেই। একই রকম নাটকের সংলাপ, স্বগতোক্তিতে দীর্ঘ দীর্ঘ পয়ার ত্রিপদীর ব্যবহার সম্পর্কেও বহু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথাও উল্লেখ্য যে তখনো পর্যন্ত বাংলায় যথাযথ নাট্যভাষা গড়ে ওঠেনি। তারাচরণ নাটকের বিজ্ঞাপন অংশে সে কৈফিয়ত দিয়েছেন, ''বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কার পরিহীনা, এবং তাহার দারিদ্রাবস্থারও শেষ হয় নাই।''[৪৭]

এই বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য প্রধানত মহাভারতের পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণ বিষয়ে। আলোচনার প্রথম অংশে নাটকের দৃশ্যাবলী অনুযায়ী মূল মহাভারত, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মহাভারতের সমালোচকেরা যে সকল ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বা নতুন কোন সম্ভাবনার বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে কি না তাও তুলনামূলক ভাবে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত বহু বিখ্যাত নাটকের কাহিনি যেমন মহাভারত থেকে নেয়া হয়েছে, তেমনি বাংলা নাটকের জন্ম লগ্নে নাটকের অনুসন্ধানে নাট্যকারেরা কালজয়ী মহাভারতকেই উপজীব্য করেছেন। বাংলা নাটকের উদ্ভবে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবের কথা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু অনেকানেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাট্যাঙ্গিকের মতো নাট্যকাহিনিও যে বিলেত থেকে আমদানী করতে হয় নি -এ কথাও বিচার্য।

তথ্যসূত্র :

১. তারাচরণ শীকদার : 'ভদ্রার্জুন', ভূমিকা, ইস্টান পারলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬

২. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী' (সুভদ্রা), পৃ: ৬০৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

৩. তারাচরণ শীকদার : 'ভদ্রার্জুন', পৃ: ১, ইস্টান পারলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬

৪. তারাচরণ শীকদার : ঐ, ভূমিকা, ঐ

৫. তারাচরণ শীকদার : ঐ, ভূমিকা, ঐ

৬. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ: ৮৬ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১,

৭. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২১৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০১৩

৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), অনুদিত, পৃ: ২৬২, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ২৬৩, ঐ

১০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ২৬৩, ঐ

১১. ড. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস',পৃ : ৪৭, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

১২. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস' (৩য় খণ্ড),পৃ: ৯৯ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬

১৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), (অনুদিত) পৃ: ২৬৮, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ২৬৮, ঐ

১৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৩৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০১৩

১৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৩৬, ঐ

১৭. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৩৭, ঐ

১৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২১৮, ঐ

১৯. তারাচরণ শীকদার : 'ভদ্রার্জুন', ভূমিকা, ইস্টান পারলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬

২০. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ: ৬৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

২১. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'বাংলা নাটকের বিবর্তন', পৃ: ৫২, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

২২. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২১৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০১৩

২৩. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : মহাভারতের অষ্টাদশী (সুভদ্রা), পৃ: ৬০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

২৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), (অনুদিত), পৃ : ২৬৭, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ

২৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ

২৭. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২১৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০১৩

২৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২২০, ঐ

২৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), (অনুদিত), পৃ: ২৬৭, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৩০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২২১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০১৩

৩১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৩৫, ঐ

৩২. কাশীরাম দাস : ঐ

৩৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৩৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০১৩

৩৪. কাশীরাম দাস : ঐ

৩৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৩৭, ঐ

৩৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৪২, ঐ

৩৭. কাশীরাম দাস : ঐ

৩৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৪৮, ঐ

৩৯. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৪৬, ঐ

৪০. কাশীরাম দাস : ঐ

৪১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৪৮, ঐ

৪২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ: ৮৬, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ,২০০৯,

৪৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস' (৩য় খণ্ড), পৃ: ৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬

৪৪. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ: ৮৭, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

৪৫. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'বাংলা নাটকের বিবর্তন', পৃ: ১৬০, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

৪৬.. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : ঐ,

৪৭. তারাচরণ শীকদার : 'ভদ্রার্জুন', ভূমিকা, ইস্টান পারলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬